বড়মিয়া

আবুবকর সিদ্দিক

(ক)

মানুষ বড় কঠিন সেয়ানা। টাউটারি বুদ্ধি, যাকে গাঁইয়া ভাষায় বলে চইতা বুদ্ধি, তার কূটকচালিতে ফেলে বনের বাঘকে বনছাড়া করার দশায় নিয়ে এসেছে। বাদাবনের বড়মিয়া এখন ঘাড় গুঁজে কান চুমরে পালিয়ে বেড়ায়। আহা! ল্যাজ নোয়ানো ছুটুমিয়া! পশুর গাঙ থেকে মালঞ্চ-মোহনা অব্দি তার সে ডোরাগাটা রবরবা আর হাঁকবরদারি গেরেস্তারি বোলবোলাও হাল দিনগুলোতে ফুটুস ধোঁয়াশা। কহন বাদা এত সদর আগে তো হয়নি কখনো। না পাকিস্তানি আমলে, না বঙ্গবন্ধু - জিয়া - এরশাদের আমলে।

সিডরের ঝড়ে বনবাদড়া মিশমায় হয় বটে। সে তো সময়িক। মানুষের তাণ্ডবে গোটা সুন্দরবন সারাক্ষণ থরহরি কম্পমান। জলদস্যুরা জেলে-নৌকোয় ডাকাতি করে। জেলে-বাওয়ালি কারো মাফ নেই। ট্রলার থেকে সাগরে ছুড়ে দেয়। কয়েদ করে রাখে লাখ টাকার পণের ডিম্মিতে। বনবিভাগ তটস্থ। আপস-আঁতাত, যে-ফিকিরে সুবিধে সেই টোটকায় টিকে থাকে। চাঁদপাই-ডাংমারি থেকে নলেন (নলিয়ান)— বুড়িগোয়ালিনী, কত নিরাপদ ছিল এসব এলাকা! আগে আবাদি বাওয়ালি-মৌয়ালি জনমানুষেরা আশেপাশের হরিনগর, কৈখালি, চণ্ডীপুর, দাতনেখালি, কদমতলি, নীলডুমুর, নওয়াবেকী থেকে গোলপাতা-কাঠ কাটতে কাটতে, মধু সংগ্রহ করতে করতে, মাছ ধরতে ধরতে চলে যেত বঙ্গোপসাগরের নোনা ঢেউ - লাগা দূর-দূর হিরণ পয়েন্টে, কটকা, কচিখালি, দুবলার চর, চরকুকরিমুকরি অব্দি। সেই ধাত্রী সুন্দরবনের ঘাঁতেঘোঁতে এখন জল্লাদ-জলদস্যুর হানা। ডাঙার বাঘ, জলের কুমিরকামট কাউকে রেয়াত করে না ওরা। বড়মিয়ার কল্লা কাটে, ডোরাকাটা চাম ছুলে বাজারে বেচে, চোখে আঙুল ঢুকিয়ে কুমির ঘায়েল করে।

(খ)

বলে, এমন ধারা বুনো নৈরাজ্যে কেমন করে জানমান নিয়ে দিন গুজরায় বাদার বনেদি বনবাসী? বকেয়া আলি ওরফে বকাআলির বড় জীবনসংশয়। মা-বাঘিনী বুড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বার্ধক্যে নয়, মরল শেষে সিডসের প্রলয় জলোচ্ছ্বাসে। দুহাজার সাতের পনেরো নভেম্বর রাতে ঘূর্ণিঝড়ের তোড়ে উড়ে ভেসে গিয়েছিল। পরদিন ঘাগরামারির খাল থেকে বনবিভাগের গার্ডরা লাশটা তুলে নিয়ে যায়? ছিল একটি বোন বনবালা নামে। ক্ষুধার তাড়নায় মান্‌ফেলা - লোকালয়ে নেমে এসেছিল। কদমতলা গ্রামে এক গেরস্থের দাওয়ায় বাঁধা ছাগলের ঘেঁটুতে দাঁত বসিয়েছিল। গ্রামবাসী খোন্তা-কুড়ুল-লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারল বনবালাকে। ছবি দেখোনি? দৈনিক ডেসটিনির ৪/৯/২০০৮ -এর সংখ্যায় দশম পাতায়। শার্ট-প্যান্ট পরা বীর পুঙ্গবরা বনবালার লাশের পাশে হামা দিয়ে বসে কেমন কেরদানি মেরে পোজ দিয়েছে! মা ষষ্ঠীর কৃপায় একলপ্তে আরো কটি ভাইবোনের জন্ম দিয়েছিল মা-বেটি। যেন ধারা বিয়োয় বাঘিনীরা। এক খাপে তিন-চারটে করে। সেগুলোকে চিবিয়ে সাবাড় করেছে বাবা-বাঘ। নাগাল পায়নি কেবল বকাআলি আর বনবালার। মা আগেই দাঁতের ডগায় নড়া ঝুলিয়ে নিয়ে সটকে পড়েছিল। মা ছেলে-বাঘটির নাম হেলাফেলা করে রাখে বকেয়া আলি। ব্যাঘ্রসমাজের মুখে মুখে সেই নামই এখন বকাআলি হিসেবে চালু হয়ে গেছে।

(গ)

শেষ নভেম্বরের উতরসাঁঝ। গাছের মাথায় গোলা গোলা কুয়াশা জড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বনভূমি বিষণ্ণ। ওপরে বিস্তীর্ণ বসত। গ্রামের নাম মুন্সিগঞ্জ। এপারে স্বল্প আবাদ। এলাকাটির নাম গাবুরা। মাঝখানে খোলপেটুয়া নদী। গাবুরা ছাড়িয়ে বাদাবন। বন এখন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ন্যাড়া। বিরান শুধু মরা গুলো, শুঁড়ি আর মুথো। বনবিভাগের যোগসাজশে বনদস্যুরা গাছ কেটে পাচার করে দিচ্ছে। নোনাধরা গাছগুলো আগামরা রোগে নির্বংশ হচ্ছে।

কী ভার বার সুনসাসন চারিদিক!
নদীতীরে ধ্যানস্থ বকাআলি।

চোখ মেলে জিভ ঝুলিয়ে। গায়ে ডোরাগুলোয় ঢিলে ভাঁজ। গলকম্বল ঝুলে গেছে অকালপুষ্টিতে। গোঁফের ওপর ডাঁশমাছি। কিছুতে কোনো বিকার নেই। অচরিতার্থ ক্ষুধা নামক প্রবৃত্তির বিকারে মাথায় অন্ধকার চোখে আলিঝালি। যেন ধ্যানীবাবা। ওদিকে তীরের উঁচু টিলার ওপরে ঘাড়ডানা গুঁজে লম্বা ঠোঁট বাড়িয়ে বিশাল একটা মদনটাকে বসে আছে। বকাআলির মতোই ধ্যানস্থ নিঃসঙ্গ। আছে তারও কিছু চাপা বিষাদ নিশ্চয়ই। হঠাৎ জলের ওপর সাদাটে ঝলসানি যেনবা। ভুরু কুঁচকে চোখের তারা ছুঁচলো হয়ে সমস্ত স্নায়ু টানটান। মোক্ষম রিফ্লেক্স। সান্ধ্য খোলপেটুয়ার শান্ত বুকে চরিতে অশান্তি তোলা একটা মাঝারি আকারের কৈভোল দাঁতে কামড়ে তুলে নেয় বকাআলি। বরা নয়, বরিণ নয়, মোষ নয়, শেষে সামান্য একটা অবলা কৈভো মাছ, তা-ই দিয়ে এ-বেলার ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করে সে, বেহায়া বকাআলি! বেহায়া এই কসুরে যে, বনরাজের শৌর্য আখেরে কি-না নদীর বোয়ালমাংসে বন্দক রাখতে হলো! দিনতিনেক আগে জঙ্গলে গরানগাছ কাটতে- থাকা এক বুড়ো হাবড়াকে থাবা মেরেছিল পেছন থেকে। ঘেঁটু কামড়ে ধরে পিঠে ফেলে লম্ফটা দেবে, ঠিক তক্ষুণি সেথো বাওয়ালিরা কুড়ুল মেরে ছিনিয়ে নেয় জখম শিকার। বকাআলির বাম কান অর্ধেক নেমে গেছে কুড়ুলের এককানচি কোপে।

কেওড়াগাছের নিচে বসে চোখ বুজে কচরমচর করে মাছ চিবোতে থাকে। পেটের নাস্তাও হয় না এতে। দুমিনিটে ফসাঁ। শুধুহ কাঁচা আমিষের আঁশটে গন্ধ লেগে থাকে নাকের ডগায়, এইটুকু সুখ। জিভ বাড়িয়ে গোঁফের লোম চাটতে চাটতে ধীরে ধীরে জটিল হয়ে ওঠে আসন্ন

রাতের রহস্য। চারিদিক মমির মতো নিস্পন্দ। হয়তবা বড়মিয়া উপস্থিতির আতঙ্কে। এক বানরজননী তার ঘ্যানা সন্তানটিকে বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে নিয়ে চাপটি মেরে বসে আছে কাকড়ার ডালে। মায়ের বগলতলা দিয়ে উঁকি দিয়ে ঘ্যানাটি পিটপিট করে তাকিয়ে দেখছে বড়মিয়াকে।

বনের এখানটায় এই কয়েক মাইলের মটি যথেষ্ট দাবানো। যেন আকাশের ভারে গেদে বসে গেছে। ফলে এই নিচু এলাকা সবসময় জলকাদায় ভেজা থাকে। ছ'ঘন্টার জোয়ারে গরানগাছের কোমর অব্দি জলে ডুবে যায়। ভাটিতে সে-জল নেমে গেলেও জোবমাটির কালো আঁঠালো অথচ ফিনফিনে কাদায় পা আটকে যায়। শুলোর ছুঁচলো ডগার খোঁচা বাঁচিয়ে চলা দায়। বাদাবনে গাছের প্রাণবান্ধব এই শুলো। গোড়ার মাটি ফুঁড়ে ওপরে বেরিয়ে - আসা এসব উর্ধ্বমুখী শিকড়ের সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেন থেকে শ্বাস টেনে নেয় গাছপালা। সৌখিন ট্যুরিস্ট তরুণরা গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে আনাড়ির চালে হাঁটে। শুলোর খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় পায়ের তলা।

বকাঅলি জলকাদার ওপর দিযে ছড় ছড় শব্দ তুলে হেঁটে যায়। কাছেই দুয়োনির খাল। মুখ থেকে একটা ছোট খাল ভড়িয়ে এঁকেবেঁকে বড়নদীর তিরমূহোনিতে গিয়ে মিশেছে। এখানে বকাঅলি ঘাড় উঁচিয়ে আকাশ দেখার চেষ্টা করে। গেওয়াগাছের পাতায় পাতায় কাটাছেঁড়া ফালি-আকাশ। নদীখানা সাঁইচওড়া। ওপারের তীরঘেঁষে গরানগাছের ধূসর সবুজ দেয়াল আবছা মালুমে আসে। এই মাথাভাঙা তুফান নয়। পেটে ওদিকে ক্ষিধের ধুন্ধুমার। চলনে গা-ছাড়া ভাব বকাআলির। তীব্র আলসেমিতে চোখ বুজে গাল মেলে লম্বা হাই ছাড়ে। একা একা লাগে বড্ড। সোহাগী বোনটি বনবালার সঙ্গে হুটোপুটি খেলার সেই কিশোরবেলার কথা মনে পড়ে। কারা যেন একদমকায় সেই স্বাধীনতার দিনগুলো ছিনতাই করে নিয়ে নিল? শুনেছে বকাআলির পূর্বপুরুষ বড়মিয়ারা সমস্ত বাদাবনে দাপিয়ে বেড়াত। তাদের দাপে মাটি কাঁপত। বনের ফেউ-কেঁদো-শূকর-মোষ লাঙুল তুলে পালাত। সমুখ বরাবর পড়ে গেলে সেবাসেলাম পুছত। বনবীর বড়মিয়ার হিম্মত লহমার মধ্যে ছিনিয়ে নিল দোপেয়ে জন্তুদের দোনলা আগুনকল। পিছু হাটতে হাটতে বাদার বড়মিয়া এখন মুখবোজা মাথাগোঁজা জীবে পরিণত হয়েছে।

বেশ উঁচু একটা প্রাচীন টিলায় উঠে গতি থামায় বকাআলি। মনে হয় রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলের কোঠাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এসব। নোনায় খাওয়া ঘেয়ো ইট, শ্যাওলাজমা দেয়াল, পশুরগাছের চাপা গজান শান। একটা ভাঙা মন্দিরের ফাটা চাতালে রাজকীয় মহিমায় শুয়ে পড়ে বকাআলি। কেওড়াগাছগুলোর তলায় ফল কুড়িয়ে খাচ্ছিল হরিণেরা। বানরের দল কেওড়াগাছের ডালে বসে কু দিয়ে হুটহাট করে নিচে হরিণগুলোর জন্যে কেওড়াফল ফেলছিল। বাঘের গন্ধ পেয়ে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেছে সব। আহা! হরিণমাংসের স্বাদ মনে পড়ে যাওয়ায় জিভ সুলিয়ে লালা এসে যায়। এমনও দিন গেছে, একটা মদ্দাবানরকে থাবার চাঁটিতে ছুড়ে জোলাখাল পার করে দিয়েছে। হায় রে! দেখতে দেখতে কোথায় গেল সেসব বাদাকাঁপানো দিন?

অনেকক্ষণ ধরে একটা দশাসই তারকেল চাতালের নিচেকায় ছনঝোপে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বকাআলিকে নজর করে দেখছে। কোথায় তার গর্ত কে জানে? কতক্ষণ ধরে এরকম কৌতূহল ধরে তাকিয়ে আছে কে জানে? মনে হয়, ওদের অনাহত রাজ্যে বকাআলি আকস্মিক অনধিকার প্রবেশকারী। অনাহত এই কারণে যে, সুন্দরবনের এই গভীর কেন্দ্রীয় এলাকাটি এখনো কুমারী। কবে কোন মান্ধাতা যুগে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ ঘেঁষে এই বিশাল বদ্বীপ জেগে উঠেছিল, ইতিহালে তার কোনো লেখাজোখা নেই। নোনা জলের টাটকা স্বাদ পেয়ে উর্বর হয়ে উঠেছিল বিশাল পলিভূমি। নদী, খাল, নোনা বাতাসে ছনছন করে গড়ে উঠেছিল ঢাউস ম্যানগ্রোভ বাদাবন। পলিদ্বীপের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বন ক্রমাগত দক্ষিণে সরে গেছে। এই বাদার মধ্যে এখনো এমন গহন দুর্গম এলাকা আছে, যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। কোথাও হয়তো রাজা প্রতাপাদিত্য বা তার খুড়োমশাই বসন্ত রায় অথবা ফিরিঙ্গি মগদস্যুরা বাস করে গেছে। তারপর বন ক্রমাগত দুর্গম ও জটিল হয়ে উঠেছে। তার কোলের মধ্যে আস্তানা পেড়েছে দুর্ধর্ষ সব শ্বাপদ জন্তু- জানোয়ার। সেখানে অদ্যাবধি অপরাহত তাদের রাজত্ব। ভযাবহ হিংস্রতার মধ্যে এও একধরনের স্থায়ী শান্তি। এই শান্তি কে ভাঙবে? বাইরে থেকে এসে থানা গাড়বে, কার এমন বুকের পাটা? বকাআলি নানা জঙ্গলঘুরে শেষে এই অজানা রাজ্যে এসে আপাতত শান্তিভঙ্গের হেতু হয়েছে। তাকে দেখাচ্ছে যেমন বোকাবেকুব এক অবাঞ্ছিত আগন্তুক। আসলে চারদিকে এমন এক মহান নিস্তব্ধতা, যার মধ্যে বকাআলির অস্তিত্ব গুরুত্বহীন। হালকা বাতাসে শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে। শুধু তাই নয়, অদূরে কোথাও বড় কোনো খাটখাল আছে, একটানা শাঁই-শাঁই শব্দে তার জানান পাওয়া যাচ্ছে। তবু সমস্ত আওয়াজ মিলিয়ে কী এক সমুচ্চ নীরবতা বিরাজ করছে। দিগন্তব্যাপী মহান নৈঃশব্দ বুকে নিয়ে বাদাবন যেন যোগাসনে বসেছে। তার এই অটল ব্যক্তিত্বের বর্ম এখনো অটুটু। মানুষের দাঁতনখ এতদূর অব্দি খামচা বসাতে পারেনি। হঠাৎ করে আনতাউড়ি এসে পড়েছে বহিরাগত বকাআলি। সেও ধীরে ধীরে বশীভূত হয়ে যাচ্ছে। বনভূমি প্রসারিত বাহু মেলে তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। একটুখানি বিরামের মওকা পেয়ে খোলা চাতালে বুকপেট হেটকিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বকাআলি। ঝোলা সাদা পেট নেতিয়ে সামনের পা'দুটি লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে। নখগুলো থাবার মধ্যে গুটানো এখন। মুখটিও দুই ধাবার মধ্যে ন্যস্ত। যে-দুটি চোখ শত্রু বা শিকারের আঁচ পেলে রাত-আঁধারে আগুনের গোলার মতো জ্বলে, সেগুলো মিয়ানো। আধবোঝা চোখে ঢিমে আলসেমি। গাল হাঁ করে দুটো পরিপূর্ণ হাই ছাড়ে বকাআলি: ঘ্রে-আউ! রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হাই। সম্পূর্ণ মেলে দেওয়া আব্রহ্মাণ্ডবিস্তারী মহাব্যাদান। ঊর্ধ্বআধোজোড়া নিখিল দ্যাবাবিশ্বের অন্তরীক্ষ সবিতৃমণ্ডল সেই গহীন গহ্বরে শরণাগত। বহুদিন পর জুতমতো মৌজ এসে যাওয়ায় বকাআলি গাল মেলে চোয়াল ঝুলিয়ে আরেকটা আয়েশি বিলম্বিত হাই ছাড়ে: ঘ্রে - আ - উ! পাণিনি প্রমুখ পণ্ডিত মনে হয় একেই বলে 'জৃম্ভন'।

রাত ঘোরালো হয়ে আসে। বকাআলি ব্যাঘ্রপ্রজাতির ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সেকেলে অস্তিত্বচিন্তায় নিমগ্ন। নিঃসঙ্গ সন্ত্রস্ত পলায়নপর জীবন। মানুষজাতের তাড়া খেতে খেতে বাদার তলপেটে সেঁধিয়ে এসেছে। সঙ্গমপটু মানুষ সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে দিনকে দিন। আশ্রয়প্রার্থী মানুষ আবাদ বাড়াতে বাড়াতে দুর্নীতিবাজ মানুষ গাছপালা কেটে ন্যাড়া করে দিচ্ছে বন। লোভী মানুষ জীবজন্তু মেরেধরে নিকেশ করে দিচ্ছে। এমন তবে কোন গাড্ডায় গিয়ে ঠাঁই নেবে বনের পশুপক্ষী? বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। খাবার অমিল হয়ে যাচ্ছে। ছোট হয়ে যাচ্ছে তোমার মনে? হালুম! হা... লু... ম! পরপর তিনটে হায়দরি হাঁক দেয় বকাআলি, জমিনে মুখ রেখে। জমিন ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ওপারে মুন্সিগঞ্জ অব্দি

আবাদের তল্লাট কেঁপে ওঠে দুরদুর। বাঘের গুণিন আদুবুড়ো ধুলোপড়া ছাড়তে ভুলে গিয়ে বদনা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে টাট্টিখানায় দৌড়ায়। মাঝপথে হোঁচট খেয়ে বদনার জল ভুঁইয়ে গড়ায়।

(ঘ)

ন্যূনতম খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের টান বকাআলিকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে রেঞ্জছাড়া করল। রেঞ্জ থেকে রেঞ্জে শুরু হলো তার হিজরত।

সময়টা বাংলায় বলে ফাল্গুন মাস। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে মদো বাতাস উঠে আসে। সুন্দরী-গরান-বলাগাছে নতুন পাতা গজায়। খলসিফুল ফোটে ডালে। ফুলের কোষে মধু জমে রাতভর। মদির গন্ধে ম-মগ করে বাদার দ্বিগ্বিদিক। মাতাল মৌমাছি ছোটে ভনভন করে। এসব বিলাসিতায় নজর দেবার ফুরসত নেই বকাআলির। জোয়ারের জলে বনতল ভেসে যায়। জলকাদা ছেতরে গোঁ ধরে হেঁটে যায়। কখনো দুলকি চালে, কখনো তুরন্ত কদমে। বুকের মধ্যে গোঁত্তা খায় অভিমান - হতাশা ক্রোধ। তার ওপর আরো বলবৎ ক্ষুধার আগুন গনগন। মাঝপথে একটা দাঁতভাঙা বুনোশূকর জুটে গিয়েছিল কপালে। তিরিশ-পঁয়তিরিশ কেজি ওজনের সে-শিকারের মাংসে সপ্তাহখানেক অন্ত্রনাড়ি দাহ ভালোই চাপা ছিল। ফের আবার শুরু হয়ে গেছে। কী দিয়ে জামিন রাখে পেট? নদীতে নেমে গোগ্রাসে নোনা জল গেলে। নুনের আরকে তলপেট জ্বলে যায়।

বকাআলি ঠাহরে পায় না কী সে অদৃশ্য শক্তি তাকে এমন গোঁ-ধরা কামানগোলার মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ডালপালার পাতায় পাতায় বাতাস ঝুমঝুম করে। দক্ষিণবায়ু উঁচু গাছের মগডালে শাঁই - শাঁই রোল তোলে। কামবেগ। দুর্মদ কামবেগ প্রকট ইন্দ্রিয়ে ধুন্ধুমার তুলে দিয়ে বিপন্ন করে বকাআলিকে। শার্দুলগর্জনে ডাক পাঠায় দূর কোনো অজানা জঙ্গলের অনামা বাঘিনীর উদ্দেশে। বনভূমি বিপদ গোনে। নদীর তলায় বক লাগে। বনবিবির নামে বাওয়ালিদের উৎসর্গ করে বাদাবনে ছেড়ে দেওয়া বনমোরগ আঁতকে উঠে কঁক-কঁক করে উড়াল দেয়। ফেউশেয়াল নিজের পুঁটিপরাণটুকু নিয়ে গোদলে হাপিস হয়। স্বভাবে লাজুক বকাআলি নামে এই মহাপ্রাণীটি মেটিং সিজনের ফেরে পড়ে কেমন নির্লজ্জ -মত্ত হয়ে উঠেছে! আগুনের ছর্‌রা ছুটছে নাসারন্ধ্র দিয়ে। চোখে ঝলসে উঠছে ঝকঝকে লালচে আলো। ওপর - নিচের জোড়াঠোঁট কেলিয়ে ভয়াবহভাবে দাঁত খিঁচায় ঘনঘন। পেটের ক্ষিধে মিনমিন করে মিইয়ে গেছে রাতের প্রথম প্রহরেই।

বকাআলি যৈবনজ্বালায় জ্বলে ধিকিধিকি। যৈবনজ্বালা দারুণ জ্বালা নিভাই কেমনে! কিসে মেটায় কিসে মানায় এ-অঙ্গারজ্বলন দাহ? শিরে আগুন শিরায় আগুন বকাআলি দাউ-দাউ যৌবনজ্বালায় গা-গা করে। বাবা গাজীপির! আসান করো! মা বনবিবি! তোর সন্তান দগ্ধে হাড় কালা করে। কী বিশম এ-দমস দশা! তোর জানে কি পেরেশানি লাগে না গো মা -জননী মদকলমাতাল বকাআলি তীরবেগে মূত নিক্ষেপ করে পেঁচিয়ে -ওঠা মোটা হ্যাঁতালগাছ তাক করে। ঝাঁঝালো তরল রসে জমিন ভেসে যায়।

(ঙ)

ব্যাঘ্রতটীতে ভোর হবে এখন। কে সে বাদাবনের নাভিমূলে প্রোথিত এই খণ্ডটির নাম এমন বিশুদ্ধ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন করেছিল জানা নেই। তবে সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খিলনার ইতিহাস ও এ এফ এম আবদুল জলিলের সুন্দরবনের ইতিহাস বই-দুটিতে এর সত্যতার সপক্ষে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ মিলবে।

ব্যাঘ্রতটী জাগছে

নদী ও নিসর্গ আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে। বাঁ-দিকে নহখাগড়ার বন। ডানদিকে ভাটি - লাগা টানা চর। সরকাদার ওপর চা-পাখি, বাটান, গুলিন্দা পাখি লাফিয়ে লাফিয়ে কীটপতঙ্গ ধরছে। একটা জাঠুয়াবক লম্বা ঠোঁডের ডগগরা মাছ ধরে কোঁৎ করে গিলে ফেলল। ফিড্‌লার (বেহালাবাদক) কাঁকড়ারা সামনের মোটা মোটা দাঁড়াদুটি মুখে মুখে লাগিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। গেওয়াগাচের ডালে ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছে বানরদম্পতি। তাদের চ্যাংড়া ছানাগুলো চরো মাটিতে আঙুল চালিয়ে দিয়ে জালিঘাস তুলে খাচ্ছে। দূরে অনেক দূরে একপাল চিতল হরিণ কেওড়ার ফল খুঁজে ফিরছে গাছতলায়।

ভেড়িবাঁধের ওপর হামা দিয়ে বসে ডানথাবার ওপর হাঁড়িমুখ নামিয়ে বকাআলি ঊষাক্ষণের জীবনলক্ষণ দেখছে। চোখে তার প্রসন্ন দৃষ্টি, মন খোসমেজাজে টইটম্বুর। ভোররাতের দিকে একটা বেআদব আজদহানাগ পেঁচিয়ে ধরেছিল তার শরীর। সেটাকে দাঁতেনখে কুচিকুচি করে চিবিয়ে খেয়েছে। শরিফ মেজাজে আবাদগঞ্জের বাবুদের মতো জাঁক করে এঁটোমুখ আঁচানোর শখ হয় তার মনে। গদাইলশকরি চালে নদীতে নেমে যায়। আয়েশ করে এগোতে এগোতে একেবারে বুকজল অব্দি চলে আসে। হঠাৎ প্রচণ্ড আলোড়নে ঘুরিয়ে ওঠে জলের তলা। বুঝি কোনো মেছোকুমির ঝিম ধরে শুয়ে ছিল তলবাগে। ঝিমুনি চটে গেছে তার। জাতেন্তি ক্রোধে বকাআলির পেঠনঠ্যাং কামড়ে ধরেছে। বকাআলি মনে মনে মোটেই তৈরি ছিল না। ভোরাবিহানে এরকম ইউকো বখেড়ার পাল্লায় পড়ার জন্যে। কামটকুমিরের দাঁতের পাটিতে জাঁতার আঁটুনি। দারুণ আক্রোশে পা-ঝাড়া দিয়ে ছাড়াতে চায় আপদ। পায়ের ধোড়ায় আরো এঁটে বসে কামড়। বাঘের জোর সামনের পায়ে। পেছনের পা তুলনামুলকভাবে বলকাবু। তবু বাঘের পা বলে কথা। প্রচণ্ড হিম্মতে লাথি ছোড়ে বকাআলি। চোয়াল এঁটে বসেছে। চাখে দিয়ে আগুনের ফুলকি ঠিকরোচ্ছে। গা গা গর্জনে ব্যাঘ্রতটীর গাছগাছালি মাটি-আলগা হয়ে যায়। পাখপাখালি চিক্কুর পেড়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। হরিণগুলো ছিটকে উঠে লাফে লাফে বাতাস কেটে ধায়। বকাআলি হিঁচড়ে হিঁচড়ে কুমিরটাকে চরে টেনে তোলে। বিরাশিসিক্কার এক চাঁটি মেরে হাটিয়ে দেয় জন্তুটাকে। রুঠো পিঠ লম্বা ঠোঁট বদ-চেহারার কুমিরটার দিকে একপলক কৃপাল চোখে চেয়ে দেখে। তারপর জখম পা থেকে রক্তের দাগ রেখে রেখে রাজকীয় ভঙ্গিতে ডাঙায় উঠে আসে: হালুম! কী আশ্চর্য! একটা সাপখোপে তিলাবাজ এতোক্ষণ বাইনের ডালে বসে সকালবেলার এই ডকুমেন্টারি দৃশ্য দেখছিল। ক্বর্...ক্বর...ক্বর্‌র্‌র্...তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের গলায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে আকাশে উড়াল দেয়।

নাহ! এ-জায়গাটা বড় কুফা আছে। সকালবেলায়ই খিচড়ে দিয়েছে মেজাজ। মানে মানে কেটে পড়া মঙ্গল। ভেবেছিল জিরিয়ে নেবে

খানিকক্ষণ? যাযাবর বকাআলির নসিবে বিরাম হারাম হয়ে গেছে। স্বস্তি বলে নিরাপত্তা বলে, সবকিছু বেনিশানা হয়ে গেছে তার জীবনে। শুধু তাই নয়, মাতৃভূমি এই বাদা, আজন্মা ধাত্রীমাতা এই বাদাবন আছ যাচ্ছেতাই আধাখ্যাঁচড়া খতরনাক হয়ে উঠেছে কুল্লে সমস্ত বনবাসী জীবজন্তুর জন্যে। হয়তো এই নদীতীরে আরো বিপদ অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। উঠতি লাল সূর্যকে পেছনে রেখে বকাআলি বনে প্রবেশ করে। সমুদ্রে বেতঝোপে ঢাকা বিঙাস বাঁওড়। বেতকাঁটায় ঘাড়ের চামড়া ছড়ে যায় সামান্য। চিনচিনে জ্বলুনিতে বিকার নেই কোনো। বাদাবনে স্বাধীন মহিমায় বিচরণের জন্য সৃষ্টিকর্তা পুরু করে দিয়েছেন এদের গায়ের চামড়া। বাঁওড়ে ভাটির জলে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে নোনা কাদা। হেলেদুলে পাড়ে উঠতেই আবার গিলেলতার বেষ্টনী। দিয়াড়ার মতো একটা ফাঁকা জায়গায় উঠতেই কপিশলাল রঙের একটা কাপড়ের টুকরোর দিকে নজর চলে যায় বকাআলির। ঝাঁকড়া ধোন্দলগাছের মাথায় লটকানো পুরুষলোকের শার্ট। মাথা উঁচিয়ে ওপরদিকে চেয়ে দেখে। পতীরঙের ওপর ছোপছাপ লালরং মাখানো। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝতে পারে, বাদার এ-দিয়াড়াটুকু এখনো গরম আছে। বাঘে - ধরা লোকটার রক্তমাখা শার্ট ওটা। বড়মিয়া আছে ধারেকাছে। সঙ্গের লোকরা আনপড় আগন্তুকদের হুঁশিয়ারি করে দেওয়ার জন্যে গাছের ডগায় কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছে। ভীষণ বিরক্ত হয় বকাআলি। মানুষ তো আর বড় দুশমন সন্দেহ নেই। ক্ষেত্রবিশেষে তার স্বজাতিও দুশমনিতে কম যায় না। আপনপর নির্বিশেষে লড়াই করে করে এখন পেরেশান সে। সারা অঙ্গে দাঁতনখেও দাগ। কত আর! এবার একটু বিশ্রাম চাই। মাথা গোঁজার গর্ত, পেট পোরা খাদ্য; — আর যে দুর্বার জ্বালার দাহটা নিম্নাঙ্গ জুড়ে টানাটানি দিচ্ছে, তার নিবৃত্তি। ল্যাঠা এড়ানোর জন্যে বকাআলি দিয়াড়াটাকে পাক দিয়ে ঘুরে ধোন্দলগাছের বিপরীত দিকের চটান ডহরজমিতে নেমে আসে। ডহরের পর পাশাপাশি দুটো প্রাচীন ওড়াগাছ। সেখানে পৌঁছেই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে জানখালাস দশা হয় তার। পচা লিভারের যন্ত্রণায় ওড়াতলায় গড়াগড়ি খায় বকাআলি।

ঘোরের মধ্যে হাঁসফাঁস করতে থাকায় ফাঁকে চটকা ঘুম এসে গিয়েছিল। বেলা যখন মাঝআকাশে, বকাআলি চোখ মেলে চায়। একটু একটু করে স্মৃতির দলাগুলো ফিরে আসে। ক্ষুধা, কাম, নরশত্রু, কুমির, নাড়ির ক্ষত; ঢের হয়েছে, এখন তাকে একান্ত নিজস্ব একটা ঠাঁই খুঁজে নিতে হবে এই বাদামুল্লুকের কোথাও জীবনভর বহু লড়াই দিতে হয়েছে। এখন কিছুদিন আপাতত ফুরসত চায় মন। তবে মারের মুখে গাড় হেঁট করার পাত্তর বকাআলি নয়। বুনো দাঁতাল বরার বুকে ফেঁড়ে ফেলেছে। হতচেতন মানুষের বুকের ওপর থাবা তুলে গুমগুম গর্জন তুলে বন কাঁপিয়ে দিয়েছে। আদিগন্ত বাদাবনের একচ্ছত্র অধিপতি সে। রক্তে রণপিপাসা। শীতকাতর মাদীময়াল মাটি কামড়ে চোখ বুঝে পড়ে থেকে ঝিমায়। বকাআলির জাত আলাদা। এই চিরকুমারী বাদাবনের আজাদ শের আমি বকাআলি। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র আজাদি! হালু...উ...ম!

ডহরপাড়ের এ জায়গাটা যেমন উদোম, তেমনি চটান। কিছু মাছি কাটাকানের ঘায়ে বসে রস শুষছিল। একঝটকায় তাদের তাড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় বকাআলি। রাজেন্দ্রগমণে পা ফেলে ফেলে বনের গভীরে সেধিয়ে যায়। বেশ খানিকটা চলে আসার পর হঠাৎ একেবারে সামনেই জলজ্যান্ত হরিণ দেখতে পেয়ে লোভে চকচক করে ওঠে চোখ। আস্ত শিঙেলহরিণ ঢাউস শরীর নেতিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে মাটির ওপর। কী ভাগ্যি তার! গুঁড়ি মেরে মেরে কাছে যেতেই চোক ছানাবড়া। জ্যান্ত নয়, আস্ত লাশ একটা। নিপুণভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছে। সেই ফাঁদের ভেতর কৌশল করে শুয়েই রাখা হয়েছে বিষ-মাখানো শিঙেলটাকে। যে-বাঘটা মানুষ খেয়েছে, তাকে ধরার জন্যে চমৎকার টোপ। হাউঃ সাবধানী বকাআলি ল্যাজে বাড়ি মেরে শূন্যে লাফ দিয়ে ওঠে। এখাড়েও তবে মানুষের শয়তানি? ধড়িবাজ মেনিমুখো কাপুরুষ! অথচ নিজেরাই নিজদের তোল্লা দিয়ে বলে সৃষ্টির সেরা জীব! বাখামোর অস্ত নেই বেশরম বদমাশগুলোর!

একযোগে উৎপাত শুরু হয়ে যায় চারিদেক। টুঁইই...টুঁইই... হরিণেরা গাছগাছালির আড়ার থেকে অশুভ ডাক ডাকছে। বানরেরা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ডালে ডালে লাফালাফি করছে। রাগে গরগর করে বকাআলি। প্রতিহিংসা আর ঘৃণায় সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। সাদা ফেনা ছিটকে বেরোয় মুখের কশ দিয়ে। পাঁচহাত লাফ দিয়ে পিছু হটে আসে। বোঝা যাচ্ছে কাছেপিঠেই আবাদি লোকালয়। এখুনি লাঠিবল্লমটাঙ্গি নিয়ে তেড়ে আসবে সব। টোপের উদ্দেশে থুথু ছুড়ে পাশের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

কোথা দিয়ে একটা বেচয়েন বাতাস উড়ে আসছে। বকাআলির শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে চুল বুলিয়ে যায়। গাছের পাতারা গান করছে। একটা উচ্ছ্বাসের আওয়াজ আসছে দূরে আড়ার থেকে। ভাটার সংঘাতে নদীর জল ফুপে উঠেছে। দেখার দরকার নদীটাকে। বকাআলি আওয়াজ লক্ষ করে এগিয়ে চলে।

অচিরেই বেরিয়ে পড়ে নদী। দক্ষিণবাহিনী। ভাটার টানে খরস্রোতা। হুড়হুড় করে ছুটে চলেছে। প্রবল নাদ উঠেছে তুফানের বাড়ি খেয়ে। নদীর এই জঙ্গিনাচ দেখতে দেখতে মতলব আঁটে বকাআলি। এপারে এই ঝুঁরির এলাকা থেকে এক্ষুণি সরে পড়তে হবে। বাঘেখেকো মানুষের রোখ বড় সাংঘাতিক সে জানে। একের ওপরের প্রতিহিংসায় অন্যের ওপর দিয়ে পিটিয়ে দাদ তুলে নেবে। ওদের সংঘশক্তি ভয়াবহ। ছাওবুড়ো দলবেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেলাবেলি নদী পেরিয়ে ওপারে চলে যেতে হবে তাকে। হয়তো সেই আরেক মান্‌খেলা এলাকা। তবু এই ফাঁদপাতা এলাকা থেকে মুক্ত মাটি তো বটে। বকাআলি লাফ দিয়ে ভাঙাড়ে নেমে আসে।

ওপারে একটা বলাঝাড় সই)নিশানা করে নদীতে ঝাঁপ দেয় সে। অফরবেলা তখন। ভাটার ভরাকটালের টান। বকাআলিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় সাগরে। জল থেকে নুনগন্ধ উঠে বাতাসে ছরিয়ে যাচ্ছে। নুনে জ্বলে যাচ্ছে চোখের মণি। ওপারে গাছের নিশানা স্রোতের টানে বরাবার পিছিয়ে পড়ছে। বকাআলির গোঁ— বাঘের গোঁ। অমিত শক্তি দিয়ে জলের ওপর ঠায় অবিচল থেকে ওপারে বলাঝাড়ের নিশানা সরাসরি লাগসই রাখতে চায় জলের ওপর বিরুদ্ধতোড়ের প্রচণ্ড চাপের মুখে তার উত্তরমুখে দেহ কাঁপতে থাকে থরথর করে। প্রায় ঘন্টাখানেক লড়াইয়ের পর বকাআলি ওপারের বলাঝাড়ের সোজাসুজি তীরে উঠে আসে। সন্ধে হতে তখনো বেশ দেরি।

(চ)

এ-গ্রামের নাম এখন 'বিধবাদের গ্রাম'। মূল নামটি দাগ-পর্চা-খতিয়ানের কালো হরফের অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। রক্ত আর দীর্ঘনিশ্বাসের দলা

পাকিয়ে পাকিয়ে এই সাতটা হরফের দুটো শএব্দই এখন কালসই হয়ে গেছে নামটি। বাস্তবিক একটা মোটামুটি দেখনসই সুস্থসবল পুরুষলোকের দেখা পাবেন না আপনি এ-গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে। সব নিকেশ হয়ে গেছে কালান্তক যম বাঘের পেটে। এখন যেসব ল্যাংড়া-নুলো-পঙ্গু মানুষদের দেখতে পাচ্ছেন, এরাও সবাই বাঘের গ্রাস থেকে বেঁচে-যাওয়া এঁটো মানুষের দল। ঘরে ঘরে বাঘের মুখে যৌত হওয়া গেরস্ত পুরুষদের বিধবাদের আহাজারি। সারা দিনমান গেরস্থালি কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় তাদের। যাতে শোক উথালে ওঠে সন্ধের পর। মুখের চোপায় পান-শুপারি পুরে চুল এলিয়ে পা বিছিয়ে বসে পতিশোকে কুয়োল দিয়ে মরাকান্না কাঁদতে বসে এ-গ্রামের বেওয়া নারীরা। সন্ধের পর কোলের গ্যাদা বাচ্চারা দুধের তেষ্টায় মায়ের শুকনো বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। শব্দ করা বারণ। গ্যাদাগেদির কোনোটি যিদি কাঠপিপাসায় ডুকরে ওঠে, মুখে হাতচাপা দিয়ে মা তাকে নিরস্ত করে: ওই যে বড়মেয়া আসে! অন্ধকারে উঠোনে ভাম বা বনবেড়ালের চলার শব্দ হলে গেরস্থেরা আতংকে তটস্থ হয়, বুঝি বড়মিয়া এসেছে।

সন্ধ্যা ঘোরালো হতে না হতে এ গ্রাম জুড়ে মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা নেমে আসে। যেন হিমজমাট মৃত্যুপুরী। শুধু দূর কোনো কুঁড়েঘর থেকে নিয়তির কুশিল আমহনামার মতো ছহিলদ্দি মুন্শির নিজের লেখা পুঁথির সুরেলা বয়ান ভেসে আসে:

একে একে দুএয়া ভাইয়ো বড়মেয়ার প্যাটে যায়
দুঃখী নারী শোকে জার জার উটানেতে গইড় খায়।।
মরি হায় রে হায়।

কত চউখের জলে লেখা এই সাকিনের নাম।
মুখে মুখে রটনা হয় বিধবাগো গ্রাম
মরি হায় রে হায়।

লম্ফর সলিতার ধুঁইয়ে ওঠো শিখার সঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে এই বুকফাটানো মাতন। মৃত্যুর আগেই নিঃসাড় মমি হয়ে যায় 'বিধবাদের গ্রাম' খানি।

(ছ)

ভাটিগাঙের দেশে অপ্রহর বিকেলবেলাকে অফরবেলা বলে। অফরবেলা মাছ ধরতে ধরতে সময়ের হুঁশ নেই বেউলাবেওয়া। কোমরজলে দাঁড়িয়ে নীলরঙের খ্যাওজাল দিয়ে চিংড়ির বেণুপোনা ধরে সে। ধরে ধরে কোমর অব্দি গোটানো কাপড়ের কোচড়ে রাখে। গামছা একখানা আছে, সেটা শতচ্ছিন্ন ত্যানা। গায়ের কালো রং নোনা জলে ফ্যাকাশে মেরে গেছে। চুল তার কটাশে জট। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে হাজা।

জোয়ার ফিরবে এবার। মন্দা লেগেছে। হেঁটে আসছিল। নিরাবরণ বেউলাকে দেখে থতিয়ে যায় সে। চুপি চুপি চোরপায়ে নিচেয় চরকাদায় নেমে আসে। হরগোঁজা ঝোপের ভেতর ঘাড়পিঠমাজা নামিয়ে মাটিতে টানা দিয়ে মিশে থাকে সে। বড় খোশদিলে আছে বেউলা। আজ মাছের ভাগ্যি ভালো তার। কোচড় উপচিয়ে দিয়েছে গাঙ। বাড়ি ফিরে গিয়ে রোদে শুঁটকি দেবে কাল। নিকেরিদের কাছে চড়া দামে বিকোতে পারবে। বেউলা পরনবসন খুলে ফেলে। ঘোলাজলে ধুয়ে নিঙড়িয়ে ফেলে কাপড়খানা। রোদ নেই তবু চরের ঘাসে মেলে দেয়। চরকাদা মেখে মাথা দুতে থাকে। গুনগুন করে গীত গাইতে গাইতে কন্যা গাত্রামঞ্জন করে। তার দমকলে আউলা গা দেখে ভিরমি যায় বকাআলি। অজ্ঞুন লাগে দুটি চাখে। মুখ দিয়ে লালা ঝরে সড়ুসড়ু করে। জিহ্বা দিয়ে অধর লেহন করে। কাপড়খানা তুলে নেয় বেউলা। মাছের পুঁটলিসুদ্ধ ঝুলিয়ে দিয়েছে কনুইয়ে ভাঁজ থেকে। গুরুতর শ্রোণিবারে আ-নতা জাউলানি-ললনা মদালস পায়ে লেলেদুলে চলে ঘরপানে। সেই-না রূপে নয়ন দিয়ে নয়ন হারায় তরুণ বাঘ বকাআলি। পাশের ঝোপঝাড়ে গা ঢেকে মাটিতে বুকপেট মিশিয়ে বেউলাকে অনুসরণ করে সে।

বেউলার ঘরখানা ফকিরফোকরার ঝুপড়িমতন দেখতে। স্বামীকে বাঘে নয়ার পর নতুন করে কাঠামো খাড়া করবে, সে মুরোদটুকু আর হয়ে ওঠেনি। ঘরামি পুরুষ মেলানো দায়। উঠোনে বাঁশের আড়ায় ভেজা কাপড় মেলে দেয়। পুঁটলি খুলে মাছের পোনা বাঁসে চাঙারিতে ছড়িয়ে দেয়। ঘরে আর দ্বিতীয় কাপড় নেই যে গায়ে জড়াবে। উদোম গতরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে দাওয়ার মাটিতে। আলসেমিতে ইচ্ছে করছে না উঠে লম্ফ জ্বালায়।

বকাআনি দুলতে দুলতে দাওয়ায় উঠে এলো। তার হাঁড়িপনা বিরাট মুখখানা দেখে দাঁতে চিরকুটি লেগে অক্কা পাওয়ার দশা বেউলার। বকা তাকে প্রেমগদগদ গলায় অভয় দেয়, ঘাবড়ায়ো না গো সান্দরী! আমি তোমার কোনা ক্ষেতি করবো না। সেই গর্‌র্‌র্ শার্দুলস্বরে শোয়া অবস্থায়ই ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে বেউলা। তার সারা শরীর শুঁকতে থাকে বকাআলি। দাওয়ার খুঁটির দিকে পেছনঠ্যাং উঁচিয়ে লাঙ্গুল তুলে চক্রাকারে মুতে ভাসিয়ে দেয়। মিঠে মিঠে ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে যায় চারদিক। বকাআলির নড়ার কোনো লক্ষণ নেই। সোহাগভরে লাঙুল নাড়াতে থাকে কোমল হয়ে। বেউলা করজোরে কেঁদে কেঁদে মিনতি জানায় না গো বাঘো

খাইয়ো না গো মোরে।
বাঘে নি খাইছে সোয়ামি
ঘুমায় মাটির গোরে।।

ও বাঘে মুই গো অবলা নারী
বড় অনুপায়

আমায় ছাড়িয়া দ্যাও
ধরি তোমার পায় বাঘে রে... ... ...
নবলক্ষ বেসাত আনি
ঝালি দিবো পায়।

বাঘটি খায় না বটে বেউলা বেওয়াকে, তবে তার কাকুতিমিনতিকে কর্ণপাতও করে না। একটু শৈল্পিক কায়দায় বিধবাটিকে গ্রহণ করে। বকাআলি প্রথমে জুত করে আসন নেয় মেয়েটির পায়ের কাছে। তারপর উপগত হয়ে রমণীটিতে। আধাপাশবিক-আধামমানবিক অঘটন একটি। বাদাবনের নাভিকুণ্ড মথিত করে একটি মর্মভেদী আর্তনাদ পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকশে জমাট বাঁধতে থাকে কৃষ্ণপক্ষের কালিমতে গিয়ে আঘাত হানে।

(জ)

দীর্ঘদিনের জমানো বীর্যের নিষেকমুহূর্তে উথালপাথালি বিপ্লব ঘটে গেল বকাআলির আমূল দেহযন্ত্র। হালুম! তার মহাব্যাদান থেকে বিস্ফোরিত গর্জনের নির্ঘোষে নাড়ি ছিঁড়ে গিয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে বিশ্বের এক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যজগৎ। প্রথম লাফে সে উঠোনে পড়ে। তার পরের লাফে জঙ্গলের অন্ধকার দেয়ালে গিয়ে হুমড়ি খায়। গাছের কাঁটা গুঁড়িতে ছেঁচে যায় মাথা। সারা শরীরে গর্মির আগুন ছুটছে। আগুনের রাগে দিগ্বিদিক মিশমার। কী করবে কোন্ দিকে যাবে কাকে কামড়াবে? বনভূমি লণ্ডভণ্ড করে গোঁয়ারের মতো ছুটছে। যেন একটা জেদী ঘাউড়া ক্ষেপণাস্ত্র। তার তাড়নায় আড়পাঙ্গাশিয়ার মোহনায় উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে আকাশচুম্বী জলস্তম্ভ। পায়ের তলায় দলেম'লে একাকার হয়ে যাচ্ছে সবুজ সাম্রাজ্য ও তাদের উর্ধ্বমূল শুলো। ননস্টপ রকেটের মতো ছুটতে ছুটতে মান্দারবাড়িয়ার সৈকতে এসে ভোর হয়। মান্দারবাড়িয়ার এই সৈকতভূমি টানা দশমাইল লম্বা। মস্তির দাহে সৈকতের এমাথা ওমাথা গড়াগড়ি খায়। তার গাঁক গাঁক গর্জনে পাখপাখালি - মাছ-শুশুক সব উড়ে লাফিয়ে ছিটকে সীমানাপার। বাদাবনে কি রোজকিয়ামত নাজেল হলো?

অরণ্যকান্তার নিঃশব্দ। সমুদ্র শান্ত। বকাআলি এখন গর্মি মেটানো ঠাণ্ডাআলি। সামনের থাবার ওপর হামা দিয়ে শুয়ে ইশ্‌ক্‌ভাবনায় মগ্ন। ওই দহমলে বেবস্তর মেয়েটাকে তার এখন আরেকবার খুব দেখতে খায়েশ হচ্ছে। চুলগুলো পাছাছোঁয়া। বুকদুটো তুঙ্গ মৌচাক। গানের গলা মৌজি। তাকে একবারটি কাছ থেকে নজর করে দেখা দরকার।

বকাআলি উঠে দাঁড়ায়। গোঁপে একটা চাটা দিয়ে বিশাল গলা মেলে হাই ছাড়ে। বালির ভরায় গা-ঝাড়া দিয়ে। তারপর কড়া একটা সংকল্প এঁটে 'বিধবাদের গ্রামে'র দিকে ফিরে চলে। বকাআলি মিলনোত্তর অভিসারে যায়। বনবাদাড় ভেঙে খালবিল পেরিয়ে। ধীরকদমে ছোটে। ঘন্টায় দশ-পনেরো মাইল বেগে। মুখের ওপর দিয়ে জীবজানোয়ার সটকে যেতে থাকে। ভ্রুক্ষেপ ড়েই। নতুন আশনাইয়ের নেশায় বিভোর সে

কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। বিকেলের দিকে 'বিধবাদের গ্রাম' সীমানার মাইলদুই চৌহদ্দিতে এসেই পেটের ব্যাথায় লুটিয়ে পড়ে বকাআলি। লিভারসিরোসিসের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাওয়ার দশা। বেচারা অশিক্ষিত বনের বাঘ। না প্রিন্ট মিডিয়া না ইক্ট্রেনিক মিডিয়া, কোনো আধুনিক প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে জানপহচান নেই তার। হতভাগা বুনো জন্তু জানতে পারছে না তার এই মরণব্যাধির মূলে ফারাক্কা বাঁধের কারচুপি। মারণফাঁদ এই ফারাক্কা বাঁধেরই শাসন-শোষণে শুকিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের নদী। অপরিমেয় লবণাক্ততা বেড়ে গেছে নদীগুলোতে। সেই নোনা জল গিলে লিভারসিরোসিস বাধিয়েছে বাদার বাঘ। পচাখসা লিভারের যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খেতে খেতে রাতের দ্বিতীয় প্রহরে মারা গেল বকাআলি।

(ঝ)

পরদিন বেলা দ্বিতীয় প্রহর। 'বিধবাদের গ্রামে'র ছাওবুড়ো সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মরা বাঘ দেখতে। ঘরের মধ্যে ফাটা যোনি নিয়ে আদুল গায়ে মাটিতে পড়ে আছে হতচেতন বেউলা বেওয়া। কে কার খোঁজ রাখে। তার বাড়ির কানাচে আজ মচ্ছব। বাঘের মড়ি দেখতে শত শত মানুষ ধেয়ে আসছে। কাছেই ডাকুয়াবাড়ি। তাদের পোষা কুকুরটা সকালে এসে বনের মধ্যে প্রথম বাঘের লাশ আবিষ্কার করে। একা দাঁত বসাতে সাহস পায়নি। ডেকেডুকে ভিড়িয়েছে পাড়াপড়শীকে।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এছোব কুবীর কমান্ডে চৌকিদার লাঠি পাকিয়ে ভিড় সামাল দিচ্ছে। একটু আগে আড়াইহাতী লাঠিটা দিয়ে বাঘের দেহ মেপে রায় দিয়েছে, নেজসুদধু সাড়ে দশ হাত। রয়েল বেংগোল টাইগার হবানে নিয্‌যস। খেরাজুদ্দি মুন্‌শি দুইপাটি দাঁতের কামড় দে করে বেরিয়ে থাকা বাঘের মাছিপড়া পাঁশুটে জিভের একটুখানি ডগা হেঁসো দিয়ে কট করে কেটে নেয়। শুনেছে বাঘের জিহ্বা খেলে হাঁপিকাশি সারে। তার নাতিটার জন্ম থেকে হাঁপানি। মর্তমানকলার ভিতর পুরে খাইয়ে দেবে তাকে। চেয়ারম্যান ব্যাজার চোখে তার দিকে তাকায়। মুন্‌শিমানুষ বলে কিছু বলে না। বাঘের দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ বহুৎ কিস্মতী চিজ। নখ বলো ল্যাজ বলো দাঁত বলো হাড্ডি বলো; ফরেনের চড়া দামে বিকোবে। এরই মধ্যে একফাঁকে লাঙ্গুলটি কেটে নিয়েছে কোন বিচ্ছু হারামজাদা। আধাঝুলন্ত কাটাকানটাকে রেয়াত করেচে, কারণ তার ঘা দিয়ে কলতানি ঝরছে। সেটি এখন গুয়েমাছিদের দখলে। ভালো কানটিতে পোচ বসাবে সে কায়দা নেই। পাশ ঘেঁষে মাটি চেপে শুয়ে থাকার ফলে ওটা আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। তবে বাঘের চামড়া আর মাংসে তার একার হক। বিদেশের মার্কেটে বাঘের চামড়ার দাম অনেক। শুনেছে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকায় বিকোয়। নাকি পনেরো লাখ পর্যন্ত দাও ওঠে। আর মাংস একটুখানি টেস্ট করতেই হবে তাকে। নাকি রতিবর্ধক খুব। ছোটবিবির সঙ্গে রমণরণে জুত করে উঠতে পারছে না ইদানীং। মুন্‌শি নেছারদ্দি মহাজন টেকো মাথা থেকে ফেজটুপি খুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে আবার মাথায় চেপে বসাতে বসাতে বলে, চারকুড়ি বয়েস হলোগো আমার। এতবড়ি দ্যাওর নাহাল বাঘ আমার বয়সের

কালে দেহিনেই। অনুমানে গুড়ে কই, অত্র মুল্লুকির য্যাতো য্যাতো জয়োনবুড়ো তামামডি এনার প্যাটে গেইছে। ছোভানাল্লা! চৌকিদার সরাসরি তম্বি ঝেড়ে ধাতিয়ে উঠল, দ্যাশে বর্তমানে জরুরি আইন চলতিছে। দ্যাশে বর্তমানে জরুরি আইন চলিতেছে। ফালতু কথা না কওয়াই জায়েজ। বুড়ি রমিছা বেওয়া খনখনে গলায় শানিয়ে ওঠে, আমার গ্যাদা পোলাডারেও তা'লি ই ইবলিসটের খাইছে। মার্...মার্... মার পিছেঝাঁটার বাড়ি। একটা খ্যাংরাঝাঁটা দিয়ে মরা বাঘটাকে পিটতে থাকে সে। অ্যা... ও...! একদাব্ড়িতে তাকে হটিয়ে দেয় চেয়ারম্যান। পাছে পোজ টলে যায়। বাঘের পিঠে মেম্বার তপন মণ্ডলের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। তপন মেম্বার ক্যামেরা নিয়ে আসবে। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারম্যান এছোব কুরী : ছবি খিঁচবে তপন মেম্বার। সেই ছবি ছাপা হবে 'প্রথম আলো'য়, 'যুগান্তরে'। ছবি যাবে মন্ত্রণালয়ে। তপন ফিরে এলো খালি হাতে। ক্যামেরা চালু নেই। বিগড়ে আছে বহুদিন। সারানো হয় না। তখন চেয়ারম্যানের হুকুমে বাঁশ ও দড়িদড়ার যোগাড়যন্ত্রের ছুটল সাঙ্গোপঙ্গরা।

বেলা তিনপ্রহর উজিয়ে গেছে। বকাআলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেঁদে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হলো লোকজন।

ঘরের মধ্যে মড়ার মতো পড়ে আছে বেউলা বেওয়া। তার বাড়ি ঘিরে এত যে সব কাণ্ডকারখানা, কিছুই জানতে পারছে না সে। প্রথমে তো দাওয়াতেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল। মাঝরাত্তিরের দিকে একটা নাবালকবয়েসী গ'লে উঠে এসে তার মুখ শুঁকছিল। বেউলা তখন চেতন-অবচেতনের মধ্যসন্ধিতে। হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে বসে। সে। গ'লোটা ভোঁত করে দাঁত ভেংচিয়ে পালিয়ে যায়। সহজাত নিরাপত্তার প্রবৃত্তিতে বেউলা ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে ঘরে উঠে আসে। দুয়োরে ঠেঙ্গা দেবে সে মুরোদ নেই। সেই থেকে অলম্বুষ শুশুকের মতো পড়ে আছে ঘরের কোঠায়। শুধু থেকে থেকে বিকারের ঝোঁকে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠছে।

(ঞ)

মফস্বলের ছোট শহরটিতে এ-বছর আনকোরা খোরাকের আমদানি হয়েছে। আগাম শীত মরশুমের সন্ধায় বড়মাঠে গ্রেট সুন্দরবন সার্কাস কোম্পানির তাঁবু পড়েছে। মাইকে ডুগডুগি বাজানোর তালে তালে ঘোষণা দেয়া চলছে : জবর খেলা! জব্বর খেলা! আল্লাপাকের আজব পয়দা... আজগুলি জীবন নরবাঘ। পূর্বে দেখেন নাই। নিজের চোখে দেখুন। ইস্পিশাল শো। টিকিটের মূল্য এক টাকা... একটাকা... মাত্র একটাকা।

শোনা যাচ্ছে 'বিধবাদের গ্রাম' নামের কোন্ এক অজগ্রামের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সার্কাস কোম্পানির ম্যানেজার নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে নরবাঘ নামক অদ্ভুত জীবটিকে খরিদ করে এনেছে। সে কথা বলে মানুষের মতো আবার বাঘের মতো হালুম গর্জন তুলে ডাকে। ব্যক্তিগত সুত্রে জানা গেছে, চার-পাঁচ বছর বয়েসের কালে সে মাতৃহীন হয়। তখন থেকে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছেই মানুষ? সে-ই তাকে পেলেপুষে এখন এই সতেরো বছরের যুবকটি করে তুলেছে। আখেরে নগদ টাকার লোভে তাকে সার্কাস পার্টির হাতে তুলে দিলো।

আজকেই ফার্স্ট শো? অ্যানাউন্সমেন্টের ধামাকায় লোক উপচে পড়েছে। তাঁবুর মধ্যে সবাই চোখ পাকিয়ে পাল হাঁ করে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। হ্যাজাকবাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে, ঘেরাওয়ের মধ্যিখানে একটা মানুষপ্রমাণ উঁচু খাঁচা পর্দা দিয়ে ঢাকা। ভিতরটায় কী আছে। সেই নরবাঘ কি? কৌতূহলে চোখ ফেটে পড়তে চাইছে দর্শকদের। মিউজিকের তালে তালে পর্দা গুটিয়ে গেল। একটা চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলে উঠল খাঁচার ভিতর। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে সবাই, একটা বিকটদর্শন মানুষ খাঁচার মধ্যে শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখখানা বাঘের মতো হাঁড়িপানা হুমো। বিরাট দুটো শ্বদন্ত ওপর পাটির দুপাশ থেকে বেরিয়ে নিচের ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। সারা গায়ে হলুদের ওপর কালো ডোরাকাটা পশম। হালুম! তার ভয়ংকর গর্জনে টিকিট কেটে মজা দেখতে আসা দর্শকদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সরু চাবুক হাতে রিংমাস্টার খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে। বাতাসে চাবুক ঘুরিয়ে সে খাঁচার ভিতর তাকিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে : তোমার নাম কী? খাঁচার ভিতর থেকে হেঁড়ে গেলায় জবাব আসে : নরবাঘ। আবার প্রশ্ন : তোমার আগের নাম কী? জবাব: জালেমআলি। প্রশ্ন : বাবার নাম কী? জবাব : জানি না। প্রশ্ন : মাঠের নাম? জবাব : বেউলা বেওয়া। প্রশ্ন : তোমার বাড়ি কোথায়? জবাব : বিধবাদের গ্রাম। প্রশ্ন তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে? জবাব : হালুম! প্রশ্ন : কী খাবে? জবাব : মাংস। মাংস খাবে। রিংমাস্টার ইঙ্গিতে একজন সহকারী বড় একটা জ্যান্ত ব্রয়লার মুরগি নিয়ে আসে। রিংমাস্টার মুরগিটাকে ওপর থেকে খাঁচার মধ্যে ছুড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতের ধারালো নখ দিয়ে মুরগির বুক ফেরে ফেলে নরবাঘ। তারপর কাঁচা চিবিয়ে খেতে শুরু করে দেয়। দর্শকদের চোখ ছানাবড়া। মেয়েরা ভিরমি খায়।

মানুষ বড় কঠিন সেয়ানা। স্বজাতি বিজাতি কাউকে রেয়াত করে না। খাঁচায় পুরে খেলা দেখায়। খেলা দেখিয়ে টাকা কামায়।